৪

অন্নদামঙ্গল

অন্নদাদেবী—শিববন্দিতা ও শিবপ্রতিষ্ঠিত কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী দেবীর সঙ্গে অভিন্না। তিনি গৌরী; তিনি উমা, সতী এবং শঙ্করগেহিনী শঙ্করী এবং এ সমস্তই পরমাপ্রকৃতি আদ্যাদেবীর বিভিন্ন রূপ। শঙ্করাচার্যও তাঁর বিখ্যাত অন্নপূর্ণাস্তোত্রে বলেছেন,

"কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।"

অর্থাৎ পুরাণ ও তন্ত্রের আলোকে, দেখা যায়, বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন দেবী শক্তি-উপাসনা ও দেবীকল্পনার বিভিন্ন ধারা বেয়ে ক্রমশ শিবের সঙ্গে শিবগেহিনীরূপে সম্পর্কিত হয়ে অবশেষে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাদেবীর সত্তায় মিলিত হয়ে গেছেন নিঃশেষে। এমনি একধারা উমা-পার্বতীর, অপর ধারা দুর্গা-চণ্ডীর, অন্যধারায় দক্ষকন্যা সতী। বাংলার পশুরক্ষয়িত্রী মঙ্গলদেবী লৌকিক চণ্ডীও এই পথেই একীভূত হয়েছেন শিব গৃহিণীরূপে শিবসম্বন্ধে। তবে এই সমস্ত সম্মিলনধারার কেন্দ্রসূত্রে বহমান আছে প্রাচীনতম কাল থেকে উৎসারিত মাতা পৃথিবী দেবীর উপাসনা। দেবী অন্নপূর্ণা এই সুপ্রাচীন বৈদিক ধরিত্রী দেবীরই বিবর্তিত রূপ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গা-চণ্ডীর বিভিন্ন অসুরবিঘাতিনী রূপে উদ্ভবের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় চণ্ডীর আসল রূপ দেবগণের সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জের দ্বারা "প্রজ্বলন্তী"। প্রচণ্ড অগ্নিশিখার মতো উগ্র তেজোময়ী দেবী নিধন করেছেন মহিষাসুরকে, শুম্ভ-নিশুম্ভ দুই দৈত্যভ্রাতাকে। অষ্টমাতৃকা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, কালী, কৌষিকী ইত্যাদি তাঁর সত্তার অংশ। তিনি মূলে ভয়ংকরী; যদিও শান্তি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী ইত্যাদি নানারূপে সংস্থিতা তিনি স্তুত হয়েছেন পুরাণে। কিন্তু এই দেবীই চণ্ডীসপ্তশতীতে একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন,—

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥

* * * *

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।

অর্থাৎ অনাবৃষ্টিকালে 'শাকম্ভরী' রূপে দেবী শস্য দ্বারা লোকপালন করবেন বলে

বানাচ্ছেন। বলাই বাহুল্য দেবীর এই রূপই অন্নপূর্ণা মূর্তিতে পরিণতি। লক্ষ্মীতন্ত্রেও আছে,

শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকেশা চ পার্বতী।
শাকম্ভরীং স্তবন ধ্যায়ন পূজ্য সংপূজয়ন নমন্।
অক্ষয়ামশ্নুতে তৃপ্তিমন্নং পানং ভবান্তরে।

অর্থাৎ "শতাক্ষী শাকম্ভরী দেবীই দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকেশা ও পার্বতী নামে খ্যাতা। হে ঐন্দ্রি! শাকম্ভরীকে স্তব-ধ্যান-পূজা ও প্রণাম করিলে অনন্তকাল অক্ষয় অন্ন, পান ও ঐশ্বর্য লাভ হয়।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, 'অন্নং ব্রহ্মেতি"। এই অন্নব্রহ্মের যিনি ঈশ্বরী তাঁকে তাই বন্দনা করা হয়েছে বারংবার বেদমন্ত্রে। অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে স্তব করা হয়েছে,

যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সংবভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎসা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু।

—"এর (পৃথিবীর) ভিতরে আছে সমুদ্র - আছে সিন্ধু—আছে জল—আছে অন্ন—আছে কৃষিভূমি, এতে কর্মচঞ্চল হয়েছে তারা যারা প্রাণবন্ত—যারা চলে; সেই ভূমি আমাদের প্রথম পেয় দান করুক।"

আরও স্তুতি করা হয়েছে—

যস্যামন্নং ব্রীহিযবৌ যস্যা ইমাঃ পঞ্চকৃষ্টয়ঃ।
ভূম্যৈ পর্জন্যপত্নৈ নমোঽস্তু বর্ষমেদসে।

অর্থাৎ, যাতে অন্ন—যাতে ব্রীহিযব—যার এই পঞ্চমানব—পর্জন্যপত্নী বর্ষাপুষ্ট সেই ভূমিকে নমস্কার।

এইভাবে পৃথিবী দেবী ও তাঁর পূজা থেকে শস্যদেবী ও শস্যপূজার উৎপত্তি হয়েছে, যা পরবর্তী কালে মহাদেবী পূজায়, বিশেষ করে শারদীয়া অম্বিকাপূজায়, গূঢ়গভীর স্থান লাভ করেছে। অসুরবিনাশিনী দুর্গার আরাধনায় নবপত্রিকার উপকরণরূপে এসেছে, কলাগাছ, মানকচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, অশোক ও ধান। এদের একত্রিত রূপ শস্যবধূ হল নবপত্রিকা। নিঃসন্দেহে দেবীপূজার এই উপকরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেবীর অন্নদাত্রী সত্তা। শস্যঋতুর আরম্ভে শরৎকালে তাই দেবীপূজার যে আরম্ভ তারই পরিণতি হোল বসন্তে চৈত্রের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে অন্নপূর্ণা পূজায়। অন্নের ভাণ্ডার তখন পূর্ণ, নিত্যের অন্নব্রহ্মের তখন যথার্থ লগ্ন। সুধার্তের কাছে তখন তিনিই প্রকৃত আরাধ্যা দেবী যিনি অন্নদাত্রী। এজন্যই দেবী অন্নপূর্ণা প্রকৃতপক্ষে অন্নপূর্ণা বসুন্ধরারই দয়াময়ী

মাতৃরূপ। জগতের সমস্ত প্রাণলীলার ভিত্তি যে-অন্নে, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাই তিনিই জগতের সর্বাত্মিকা শক্তি পরমাপ্রকৃতি। ভারতচন্দ্র বন্দনা করেছেন,

সব রজঃ তম তিন গুণের জননী।
অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী॥

এবং ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেব স্তুতি করেছেন,—

প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্মস্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥

নূতন মঙ্গল—অন্নদামঙ্গল কাব্যের ভণিতায় বহুবার ভারতচন্দ্র কাব্যটিকে 'নূতন মঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন। দেবী সরস্বতীকে বন্দনা জানিয়ে কবি তাঁর কবিকর্মের সাফল্য কামনা করে দেবীর কৃপাপ্রার্থনা করেছেন,

দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল॥

এবং অন্নপূর্ণাবন্দনার শেষেও কবি ভণিতায় লিখেছেন,

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অন্নদামঙ্গলের স্থাননির্ণয়ে কবিবর্ণিত এই কাব্যপরিচয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'নূতন মঙ্গল' কথাটি মুকুন্দরামও ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে,

উমাপদ-হিত-চিত রচিল নৌতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

এ থেকে একটি ব্যাখ্যা সম্ভব যে, সেকালে যিনিই ভক্তিসমন্বিতচিত্তে একটি মঙ্গল পাঁচালী লিখতেন, তিনিই সেই পাঁচালী ধারায় আরেকটি নূতন গ্রন্থ যোজনা করছেন বলে মনে করতেন। তাই প্রতিটি গ্রন্থই 'নূতন' অভিধায় ভূষিত হোত। কবিদের এরূপ অভিপ্রায়ের সম্ভাব্যতার কিছু সমর্থনও মেলে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে। তবু একথাও ঠিক যে, নিজের রচনাকে এরূপ নূতন বলে উল্লেখ সব কবিই করেননি। যাঁরা করেছেন তাঁদের সংখ্যা অত্যল্প এবং গভীরভাবে মনোযোগ করলে দেখা যাবে তাঁরা তাঁদের কাব্যের অভিনব বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সচেতন-ভাবেই এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন নিজেদের কাব্য সম্বন্ধে। মুকুন্দরামের পূর্বে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ব্রতকথা ও পাঁচালীর বিশেষত্বহীন রীতিতে লেখা হয়েছিলো। মুকুন্দরাম তাকে পূর্ণাঙ্গ পাঁচালী কাব্যের রূপদান করেছিলেন, এবং "নৌতন মঙ্গল অভিলাষে" অনেক

পুরাণ বিচার করে সেই দেবীমাহাত্ম্যাখ্যাপক কাব্যকে নূতন মহিমা দান করেছিলেন। সম্ভবত এই অর্থেই তাঁর কাব্য সে সময়ে ছিলো 'নূতন মঙ্গল'। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের অভিনবত্ব আরও নানা বৈশিষ্ট্যে অর্থপূর্ণ। ভারতচন্দ্রের কবিমানসের বৈচিত্র্যমুখী নানাচারিতা তাঁর কাব্যকেও বহুতর নূতন গুণে ভূষিত করেছে; যে কারণে অন্নদামঙ্গল কাব্য বাংলার সুবিশাল মঙ্গলসাহিত্যে আজও একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সাধারণভাবে দেব-দেবীর রূপকল্পনা ও দৈবীমহিমার ধারণায়, কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্রনির্মাণে ও জীবনচিত্রণে সকল মঙ্গলকাব্যেই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকগণ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন,—'বাংলাদেশে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরস্পর বিবদমান দেবদেবীদের মহিমাখ্যাপক এক ধরনের 'পাচালী কাব্য'। চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল কাব্যে শিবের সঙ্গে বিবাদে আপন আপন মহিমা ও প্রাধান্য স্থাপন করেছেন চণ্ডী এবং মনসা, এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমস্ত দেবতার উপরে সর্বশক্তিশালী হিসেবে ধর্মদেবতার প্রাধান্য। আবার তুলনায় দেবমহিমার চেয়ে দেবীমহিমাই প্রধান হয়েছে এইসব ভক্তিভাবুকতা-মণ্ডিত পাচালী কাব্যগুলিতে; এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো, মঙ্গলকাব্যের এই ভক্তিভাবনায় দেবতা ও ভক্তের মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়ের অনিশ্চিত সম্পর্ক। অলৌকিক শক্তিতে দেব অথবা দেবী আদায় করেছেন ভক্তের কাছ থেকে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা। কৃপা কিংবা নিগ্রহ সবটাই যেন দেব-দেবীর অলৌকিক ইচ্ছার অকারণ লীলামাত্র। মঙ্গল-দেবতার এই স্বভাবেরই বর্ণনা ভারতচন্দ্র দিয়েছেন, এইভাবে,

"অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥"

বস্তুত মঙ্গলকাব্য পৌরাণিক দেবমণ্ডলে নূতন দেবতা অথবা দেবীর অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী। এই প্রতিষ্ঠালাভ সম্পূর্ণ হয় মর্ত্যে পূজাপ্রতিষ্ঠার দ্বারা। মঙ্গলদেবতা এজন্যই ছল-বল-কৌশল সব কিছুই প্রয়োগ করে থাকেন মর্ত্যমানবের কাছ থেকে পূজা আদায়ের জন্য। কাজেই নিষ্ঠভক্তকে যেমন তিনি অপরিমেয় করুণায় সম্পদ-প্রতিপত্তি দান করেন ভক্তের প্রকৃত যোগ্যতা বিচার না করেই; তেমনি অপর দেবতার অনুগৃহীত ব্যক্তিকে নিগ্রহও করে থাকেন অকারণে। কালকেতুর প্রতি কৃপা এবং কলিঙ্গরাজের প্রতি চণ্ডীদেবীর নিগ্রহ তার উদাহরণ। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতক থেকেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ-সময়ে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছিলো তার ফলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দেব-দেবী এবং তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে অনার্য লৌকিক দেব-দেবীদের

আর্যব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেব-দেবীমণ্ডলে উন্নীত হবার ও উপরন্তু ধর্ম-সংস্কৃতির এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংশ্লেষের যে আন্দোলন চলেছিলো, মঙ্গলভক্তিভাবনা ও মঙ্গল দেব-উপাসনা তারই একটি প্রকাশ এবং মঙ্গলকাব্য তারই একশ্রেণীর সাহিত্যিক পরিণাম। স্বভাবতই তাই মঙ্গল ভক্তিভাবনায় মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতা ছিলো অনিবার্য এবং কাব্যে সেই সাম্প্রদায়িক ধর্মকলহের কাহিনীই রূপ লাভ করেছে একই বিশেষ পন্থায় গতানুগতিকভাবে উগ্র কিংবা শান্তোগ্র দেব-দেবীর উপাসনাকে আশ্রয় ক'রে। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণ এই সংঘর্ষ-সংশ্লেষ ও সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াতেই যোগ করেছিলো অতিরিক্ত নূতন দ্রুতি ও বেগ। ইতিহাসের এইদিকে লক্ষ্য রেখেই সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

"বাঙলা দেশের স্থানীয় পুরাণ কথা যেগুলি সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন 'মঙ্গলকাব্য' আকারে বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এইসব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পড়িল না; এইভাবে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, শিবায়ন ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে লখিন্দর-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপীচাঁদের কথাও পুনঃপ্রচারিত হইল। প্রাচীন কথা ও লোকগাথ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল।"

অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলি বস্তুত বাংলাদেশের লৌকিক পুরাণ—সংস্কৃত পুরাণবিধি অনুসারে, সর্গ, প্রতিসর্গ বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পঞ্চলক্ষণসহ রচিত। পুরাণের মতোই তাই মঙ্গলকাব্যের আরম্ভে থাকে, দেববন্দনা, তারপর সৃষ্টিপত্তন' কাহিনী; তারপর, দেবখণ্ড, দেবতা অথবা দেবীর দেবলোকে আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা, এবং অবশেষে 'মর্ত্যখণ্ড' যেখানে মর্ত্যলোকে ভক্তকর্তৃক পূজা প্রচারের কাহিনী। এই মূল কাঠামোর মধ্যে স্থান নেয় 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' হিসেবে কবির প্রতি দেবতার স্বপ্নাদেশ। মর্ত্যখণ্ডের বা নরখণ্ডের কাহিনীরও আছে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো;—মর্ত্যে পূজা প্রচারে নায়ক হবেন শাপভ্রষ্ট দেবতা কিংবা দেবলোকবাসী কেউ,—মর্ত্যে পূজা-প্রচার অন্তে আবার তিনি স্বর্গলোকে ফিরে যান। কাহিনীর এই নির্দিষ্ট বৃত্তে দেখা যায় আর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেমন—রন্ধন ও ভোজনের সোৎসাহ বিবরণ, ফুল, ফল, বৃক্ষ, মৎস্য ইত্যাদি বিষয়ের সুদীর্ঘ নামতালিকা, 'বারোমাস্যা', 'চৌত্রিশা স্তব' প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও এই সমস্ত লক্ষণ ও উপাদান

বর্তমান। দেববন্দনা দিয়ে তাঁর কাব্যের শুরু, তারপর গ্রন্থসূচনায় দেবী অন্নপূর্ণা কর্তৃক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ভারতচন্দ্রকে দিয়ে অন্নদামঙ্গল গীত রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ, "তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও। রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।" পরে স্বয়ং কবিকেই স্বপ্নাদেশ, "গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে। যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥" এবং সেইসঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বর্ণনা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যরীতিসম্মতভাবেই দেওয়া হয়েছে। অতঃপর 'গীতারম্ভ' হয়েছে প্রলয় প্লাবনোত্তর সৃষ্টিপত্তনের কাহিনী বর্ণনা দ্বারা,

"দেখিয়া শিবের কর্ম তাহাতে বসিল মর্ম
ভার্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥"

সৃষ্টিপত্তনের পরই দেবখণ্ডের শিব-সতী-পার্বতী কাহিনী বিবৃত হয়েছে যথাবিধি; এবং সেই সূত্রে দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তি গ্রহণ, শিবের কাশীতে অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণ ও দেবীর পূজাপ্রতিষ্ঠাসহ ব্যাস-কাহিনী বর্ণনা। এই অংশে মঙ্গলকবিদের মতো তালিকাদান-প্রবণতা দেখা যায়, বিশ্বকর্মা কর্তৃক অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণের বর্ণনায়, যেখানে, পশু, পাখী, মৎস্য, সর্প, বৃক্ষ, পুষ্প সব কিছুর বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়েছে শ্রুতিমোহন ছন্দো-বদ্ধতায়। শিবের বারোমাসের তপস্যার বর্ণনায় পুরানো রীতির সামান্য তির্যক প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। তারপর, বিশুদ্ধ মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসারে দেবলোকে কুবের অনুচর বসুন্ধরের প্রতি শাপ, মর্ত্যলোকে হরিহোড়রূপে জন্মগ্রহণ, দেবীর পূজা প্রচার, এবং অবশেষে নলকুবরের প্রতি শাপ এবং তার ভবানন্দ মজুন্দার রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ এবং অন্নদা-ঝাঁপি নিয়ে হরিহোড়ের গৃহত্যাগ করে দেবী অন্নপূর্ণার ভবানন্দ মজুন্দারের গৃহে গমন,—এইখানে সমাপ্ত প্রথম খণ্ডের দেবীকাহিনী, পূর্ণতই মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত কাঠামোর উপর স্থাপিত এবং পরবর্তী দুই খণ্ডে—'বিদ্যাসুন্দর' ও 'মানসিংহ-ভবানন্দ অংশে'—বহু অভিনব বৈচিত্র্য থাকলেও দেবী অন্নপূর্ণাকে দিয়ে ভারতচন্দ্র অবশেষে মঙ্গলকাব্যের মূল উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কেই ব্যক্ত করেছেন,—

শুন শুন ওরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥

তথাপি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য সর্বদিকের বিচারে পূর্ববর্তী সমস্ত মঙ্গলকাব্য থেকে, মূল ভক্তিভাবনায়, কাহিনীবিন্যাসে, দেব-দেবীর দৈবমহিমা ও চরিত্ররূপ কল্পনায়

গুণগতভাবেই স্বাতন্ত্র্যে ভূষিত হয়েছে। 'নূতন মঙ্গল' অভিধার যথাবিহিত যোগ্যতা অর্জন করেছে অন্তরঙ্গ বিচারে।

অন্নপূর্ণাদেবীর রূপ ও স্বভাবমহিমাতেই এই অভিনবত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট। দেবী অন্নপূর্ণা শিবগৃহিণীরূপে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না হলেও, সেই উগ্র কিংবা শান্তোগ্র চণ্ডীর কোপনস্বভাব থেকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত। চণ্ডীদেবীর উগ্রতার যে সামান্য অবশিষ্ট তাঁর স্বভাবে আছে, তা যে চরিত্রের নিন্দনীয় দিক, শিবের মুখের কটূক্তিতেই তা স্পষ্ট, "গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী।" প্রকৃতপক্ষে অন্নপূর্ণা তাঁর মূল স্বভাবে হলেন প্রসন্ন-কৌতুকময়ী দেবী; বিবাদপরায়ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠান্বেষিণী মঙ্গলদেবীদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি পুরাকাল থেকেই পরমাপ্রকৃতি দেবী হিসেবে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, তাই লৌকিক মঙ্গলদেবীর মতো দেব-মণ্ডলে নিজের স্থান করে নেবার প্রচণ্ড উগ্র শক্তির অলৌকিক লীলায় অপর দেবতার সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে তাঁকে লিপ্ত হতে হয়নি। বরং মানুষের যথার্থ ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গোড়ার সুতীব্র কঠিন শক্তির দেবী চণ্ডী থেকে 'উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র' পরিণাম-রমণীয়তায় 'মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে' বাঙালীর ঘরে রসসঞ্চার করেছেন। মঙ্গলদেবীর মতো আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন করে প্রয়োজন তাঁর নেই বলেই কাশীর অন্নপূর্ণাপুরীর রত্নপ্রতিমায় দেবীর অধিষ্ঠানের জন্য শিব এবং দেবতাদেরও কঠিন তপস্যা করতে হয়েছে; দেবী অবশেষে 'দৃষ্টি-সুধাবৃষ্টিতে' দেবতা ও ঋষিগণকে মুগ্ধ করে বলেছেন,

চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ।
অনশনে সকলের শুখায়েছে মুখ॥
এস এস বাছা সবে সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও॥

এজন্যই পরমাপ্রকৃতি অন্নপূর্ণার করুণা সকলের উপরেই যেন সমানভাবে বর্ষিত হয়। উপবাসক্ষীণ ব্যাসদেব ও তাঁর শিষ্যগণকেও অন্নদান করেন তিনি—

জগৎ জননী মাতা সবারে সমান।
... — ...
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
... ... —

হরিহর প্রভৃতিরো শত্রুমিত্র আছে।
শত্রুমিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥

এহেন করুণাময়ী দেবী মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য কোনো অকারণ কৌশলের প্রয়োজন অনুভব করেন না। দেবতার শাপভ্রষ্ট হওয়াও অকারণ নয়; বসুন্ধর এবং নলকুবরের অপরাধ ও শাপভ্রষ্টতা দেবীর ইচ্ছাধীন ছিলো না। তেমনি দেবী মর্ত্যে যাকে অনুগ্রহ করতে চাইলেন, তাকে অনুগ্রহ করার কারণও তিনি জানালেন, জগতে আপন মহিমা তিনি প্রকাশ করবেন সবচেয়ে দুঃখীজনের দুঃখ দূর ক'রে—

জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর॥

স্বাভাবিকভাবেই আপন কাজেরও ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন তিনি, যেমন বিচার করেছেন ব্যাসের অহংকারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভক্তিকে। ব্যাসের তপস্যায় চঞ্চল ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাই আপনিই প্রশ্ন বলেছেন,

তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিলে ঘোর
কি দোষে হইব রুষ্ট তাতে।

এবং আপনিই কারণ নির্দেশ করেছেন,

অসময় সুসময় না বুঝিয়া দুরাশয়
বিরক্ত করিল অত্যাচারে।

দেবী অন্নপূর্ণা যখন পতিপুত্রকে অন্নপরিবেশন করে আনন্দময় গৃহিণীপনার খেলারসে পরিপূর্ণা, তখন সেই আনন্দের সংসারে ব্যাসের প্রচণ্ড অহংকারের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দাবি নিতান্তই বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনাবিল মাধুর্যকে বিক্ষুব্ধ তিক্ততায় বিষাক্ত করে তোলাকে অন্যায় বলে মনে করেছেন দেবী। উপরন্তু ব্যাসের ভক্তিতে যে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অধিবাসন ছিলো, দেবী সেই সংকীর্ণতাকে ক্ষমা করেননি কখনও। কোনও মঙ্গলদেবী যে কথা কখনও বলেননি এর পূর্বে, দেবী অন্নপূর্ণা জানালেন সেই সর্বধর্মসমন্বয়ের দর্শনের কথা,

হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর॥

মঙ্গলকাব্যে এতোখানি উদার মহিমান্বিতা দেবী এর আগে দেখা দেননি। তাই শুধু নামে এক নূতন দেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপক কাব্য হিসাবেই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য 'নূতন মঙ্গল' নয়, মঙ্গলভক্তিভাবনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভক্তিভাবনার কাব্য হিসেবেই ভারতচন্দ্রের এ কাব্য "নূতন মঙ্গল"।

নূতনত্ব 'অন্নদামঙ্গল'-এ আরও আছে। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের মতো দৈবনির্ভর ভক্তকবি নন। রাজসভার নাগরিক মননের কবি ভারতচন্দ্র তীব্র আত্মসচেতন দার্শনিকতায় বিদ্ধ ছিলেন। ফলে মঙ্গলকাব্যের ভক্তিময় পরিমণ্ডলে তিনি অনিবার্যভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন জীবন-বিচারের আলো; তাঁর কাব্যের আধ্যাত্মিকতায় প্রতি পদক্ষেপে দেখা দিয়েছে ধর্মীয় ন্যায়-অন্যায়ের দার্শনিক বিশ্লেষণ। বুদ্ধিদীপ্ত কবি নির্দ্বিধায় আলোকপাত করেছেন মিথ্যা ধর্মাচারের দূষিত ক্ষতসমূহের উপর। ফলত অন্নদামঙ্গল কাব্য হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে মঙ্গলদেবীর কৃপা-করুণা বর্ষণের কাব্যের চেয়ে, মানুষেরই আধ্যাত্মিক চৈতন্যসাধনার ও জটিল উচ্চতর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের কাব্য। কালকেতু-ফুল্লরা কিংবা ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীমন্ত,—এদের ভক্তির লক্ষ্য ছিলো জাগতিক জীবনের অব্যবহিত বৈষয়িক ও আধিভৌতিক লাভ। সুখে-সম্পদে বাস করার নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চয়তাই ছিলো তাদের কাছে পরমার্থ। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে "মানুষের অন্নময় এই জাগতিক সত্তার" পূর্ণতা ও অভাবের সম্বন্ধে দেবীমহিমা কীর্তিত হলেও, শিব এবং এমন কি ব্যাসদেবেরও চৈতন্যসাধনার জটিল কাহিনীই রচিত হয়েছে অভিনব নৈপুণ্যে। স্বয়ং চিদানন্দের সঙ্গে চিদানন্দ-সাধক ব্যাসদেবের যথাক্রমে সুখময় ও দুঃখময় পরিণামের মধ্য দিয়ে, মানুষের পশুসত্তাউর্ধ্ব চৈতন্যময় অর্জিত-ব্যক্তিত্বের এই কাহিনীতে তাই পুরনো মঙ্গলভক্তিভাবনার সঙ্গে বৃহত্তর অনুপাতে এসে মিশেছে চৈতন্যসাধনার নূতন মাত্রা। কাব্যের আস্বাদ হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ নূতন। আর এই নূতন ভাববৃত্তে কবিও স্বয়ং তাঁর আপন চৈতন্যের অভিপ্রায়, লক্ষ্য ও প্রার্থনাকে ব্যক্ত করেছেন সরাসরি গানগুলির ভেতর দিয়ে। তাঁর ব্যক্তিসত্তার রাগ-বিরাগের মণ্ডনে কাব্যটি হয়ে উঠেছে মন্ময়ধর্মী ভাবাদর্শের অভিব্যক্তি। কাজেই অন্নক্ষুধার তীব্র জ্বালায় হতজ্ঞান হয়ে ব্যাসদেব কাশীতে অভিশাপ দিলেও, তাঁর আসন ব্যর্থতা ও ট্রাজেডী হ'ল তাঁর তপোবলের পরাজয়ে। তপোধন ব্যাসদেব সত্যই জেনেছিলেন,

তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোনখানে সমাদর নাই।

সুতরাং তিনি সংকল্প করলেন নিজেই দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করবেন,

করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকলি করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব এইখানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন॥

ভারতচন্দ্র দেখালেন, অহংকারের প্রমাদে কী করে ব্যর্থ হয়ে গেল পুরাণস্রষ্টা মহাজ্ঞানী ব্যাসদেবের সমস্ত সাধনা এবং ব্যাসদেবের ভেদবুদ্ধি থেকে কবি নিজে যে মুক্ত একথা তিনি গীতিকবির আতিশয্যে জানালেন,

একই কলেবর হইলা হরিহর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥

আত্মবিশ্বাসী আত্মসচেতন কবি তাই অসঙ্কোচে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, বাৎসল্য ভক্তির কাব্যে কামরসায়ন কাব্য বিদ্যাসুন্দর সংযুক্ত করে দিয়ে। একদিকে উদগ্র কামার্ততার জন্য তিনি অভিশপ্ত করেছেন বসুন্ধর ও নলকুবরকে; আবার পুরস্কৃত ও দেবীর আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন তিনি সুস্থ ও সবল বিদ্যা-সুন্দরের কামকলা ও সাধনাকে। একদিকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন দুর্বল মানুষের অক্ষম প্রবৃত্তির কুশ্রীতাকে, অপরদিকে সার্থক করে তুলেছেন অনাবিল মনুষ্যত্ব সাধনার দুর্মর শক্তিকে। এরই ফলশ্রুতি, কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে বিষয় হিসাবে বাস্তব ইতিহাসের অনুপ্রবেশ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে পটভূমি হিসাবে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়; মুকুন্দরামেও ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয়ের বর্ণনার পটভূমিতে সমকালীন ইতিহাসের বাস্তব ছবি অঙ্কিত হয়েছে; কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু অনুরূপভাবে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বর্ণনাই করেননি, মঙ্গলকাহিনীর বিষয় হিসেবেই ইতিহাসের মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনী বিবৃত করেছেন কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই কোনো কোনো রসিক সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্য আসলে অন্নপূর্ণাদেবীর মাহাত্ম্যধ্যাপনার বকলমে প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দমঙ্গল কাব্য।

বস্তুতই দৈবমহিমার পরিবর্তে মানব-সাধনার মহিমাকীর্তন করেছেন কবি, যে কারণে দেবলীলা সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুলেছেন কবি, "নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নয় তাহা, আমি যা খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে"। আধুনিক মননের কবি তাই কাব্যকে

শুদ্ধ ভক্তির প্রকাশ মনে না ক'রে, মানবজীবনানুরাগের রসময় অভিব্যক্তি বলে মনে করেছেন। ললিত স্বচ্ছন্দে, সরস ভাষে, জীবনরসের বাণীমূর্তি রচনাই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায় ছিলো। কলাবিদ্ কবি কাব্যরচনাকে গ্রহণ করেছিলেন শিল্পসাধনা হিসেবে। কিন্তু প্রথার দুর্মরতার কথা যেহেতু খুব ভালোই জানতেন কবি এবং সেই মধ্যযুগের অন্ত্য সময়েও যেহেতু ভক্তিময় পাঁচালী কাব্যে অধ্যুষিত ছিলো বাংলার লোকমানস, সেহেতু মঙ্গলকাব্যের বেশেই উপস্থিত করেছিলেন তিনি তাঁর প্রকৃত অর্থে এই মনুষ্যত্ব-মহিমাধ্যাপক কাব্যকে। দেখিয়েছেন, যেখানেই প্রকৃত মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই এসে নেমেছে দেবতার আশীর্বাদ; আর যেখানেই লঙ্ঘিত হয়েছে মনুষ্যত্ব-সাধনার সকল ন্যায়, সেখানেই পড়েছে দেবতার অভিশাপ। এমন কি স্বয়ং শিবও সেই ন্যায়ের শাসন থেকে মুক্ত হতে পারেননি, ন্যায়ের ব্যতিক্রমে নিরন্ন শিবেরও ভিক্ষা মেলেনি কোথাও। একই নিয়মে, ভেদবুদ্ধিজনিত অন্নপূর্ণার নিন্দায় কটুমুখ আহাঙ্গীরের উপর যেমন ভয়ংকর বিপৎপাত ঘটিয়েছেন দেবী, তেমনি আপন ভক্তের তপস্যাকেও বিফল করে দিয়েছেন ছলনার দ্বারা। গোষ্ঠীমনোভাবাপন্ন মঙ্গলকবিদের ধর্মবোধ থেকে ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধ কতোখানি পৃথক ও দূরবর্তী তার অসংশয়িত নিদর্শন কাব্যের এই ব্যাসকাহিনী। সমগ্র মঙ্গলসাহিত্যে এমন জটিল মানসিকতার অভিমানাহত দ্বন্দ্বময় কাহিনী আর একটিও নেই। দেবী স্বয়ং তাঁর ভক্তকেই ছলনা করেছেন মানবিক ন্যায় লঙ্ঘিত হয়েছে বলে; অন্নদামঙ্গল কাব্যের নূতনত্বের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

ভারতচন্দ্রের মনে বাস্তবিক সামান্যতম দ্বিধাও ছিল না যে, তাঁর কাব্য "নূতন মঙ্গল" অভিধার সুনিশ্চিত অধিকারী।

কাহিনী বিন্যাস—মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত কাহিনী বিন্যাসের কাঠামো হ'ল দেবখণ্ডে হরপার্বতীর কাহিনী বর্ণনা এবং তারপর মর্ত্যখণ্ডে শাপভ্রষ্ট দেবতার জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে পূজাপ্রচার ও পরে শাপমুক্ত হয়ে দেবলোকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিভিন্ন সংঘাতময় ঘটনাবলীর বিবরণ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও কাহিনী বিন্যাসের সেই গতানুগতিক ধারা লক্ষ্য করা যায়, হরিহোড় এবং ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান অংশে। হরপার্বতীর কাহিনীতেও উপাদানের দিক দিয়ে নূতনত্ব কিছু নেই; তবে রসসৃষ্টির দিক থেকে ঘটনাবলীকে যে রকম নাটকীয় রীতিতে সাজানো হয়েছে তা কাহিনীর আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। মুকুন্দরামের মতো ঔপন্যাসিক

রীতিতে ঘটনাবলী ও চরিত্রাবলীর আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দেননি। কাহিনীর নাটকীয় গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য বহুক্ষেত্রে স্তবস্তুতি ও তত্ত্ববিশ্লেষণের অংশ বাদ দিয়েছেন তিনি, তাঁর উৎস গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করে। যেমন—"বিস্তর অন্নদাকল্পে অন্নে কব কত। কিঞ্চিৎ কহিনু নিজ বুদ্ধিউচিত॥" অথবা "শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস। কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ।" তাঁর কাহিনী বিন্যাসে তাই কোনো অবান্তর প্রসঙ্গের স্থান নেই, কিংবা কোন ভাবময় মুহূর্তকে ঘিরে অন্তর্লীন অনুভূতি দ্যোতনা দেওয়ার চেষ্টাও নেই। অন্নদামঙ্গলের কাহিনীতে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মতো যেন প্রকৃতিও দ্রুত চলমান; এমন কি শিবের পঞ্চতপের বর্ণনাও বারো মাসের পরিক্রমায় অত্যন্ত দ্রুত গড়িয়ে চলে। তাই ধ্যানী শিবের নিশ্চল মহিমার বর্ণনার চেয়ে এই কাহিনীতে মূল্য পেয়েছে পুষ্পশরাহত কামাতুর শিবের 'নারী উপাসিয়া' ফেরার অস্থির চাঞ্চল্য। সব মিলিয়ে এ কাব্য একটি চলচ্চিত্রময় কাহিনী যেন, যার দৃশ্যমূল্য ভাবগত আকর্ষণীয়তার চেয়ে বেশি।

দেবখণ্ডের কাহিনীর শুরুতেই এই চিত্ররূপময়তা—দশদিক জুড়ে সতীর দশমহা-বিদ্যার-রূপ পরিগ্রহণ এবং মহাদেবের কাছ থেকে দক্ষযজ্ঞে যাবার অনুমতি আদায় করা। পরবর্তী, দক্ষযজ্ঞে কন্যা সতীর সম্মুখে দক্ষের শিবনিন্দায় শিবের রূপ ও চরিত্রের প্রকাশ, অপমানে-ক্রোধে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা ও দক্ষযজ্ঞ নাশ, সমস্তই একটির পর একটি নাট্যদৃশ্য যেন। শিবের দক্ষালয় যাত্রার ছবিতে দেখি—

সহস্রে সহস্রে চলে ভূতগণা।
হহঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পফণা।
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।

'মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে' দৃশ্যমান; এবং রুদ্রশিব 'দলমল দলমল গলে মুণ্ডমালা' নিয়ে ধেয়ে চললেন দক্ষালয়ের দিকে। অতঃপর দক্ষালয়ে যজ্ঞস্থানে পৌঁছে,

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
দক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
... ...
লক্ষ লক্ষ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম নাড়িছে।
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেশ পুড়িছে।

এই ভয়ানক দৃশ্যপটে আরেক কৌতুককর দৃশ্যের অবতারণা...শিবের বরে দক্ষের জীবন লাভ, কিন্তু

ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়।

শোকোন্মাদ শিব এরপর যখন,

শিরে লয়ে সতী দেহ করিলা গমন।
ভূত গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ।

তখন বিষ্ণু সতীর দেহ 'কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি'। অবশেষে "শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান। হিমালয় পর্বতে বসিলা করি ধ্যান।"

এরপরই কবি এঁকেছেন দ্রুত পরম্পরায় গৌরীর বাল্যলীলা, নারদের শিববিবাহের ঘটকালি, শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম, শিবের বিবাহযাত্রা এবং শিববিবাহের রঙ্গমুখর কৌতুককর দৃশ্যাবলী। কামভস্মের ছবি এঁকেছেন কবি,

ললাট লোচন হৈতে হুতাশন
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে।
মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মের রাশি।

আর অন্যদিকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায়, মদনের বাণে মোহিত পঞ্চানন, "বিকল হইয়া, নারী উপাসিয়া, ফিরেন সকল স্থানে।" অবশেষে শিবের বিবাহযাত্রার বর্ণনা ভূতপ্রেতদলের কাণ্ডকারখানার ছবি—

সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো
ধাবায় ধাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো।

'শিববিবাহ' এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা রঙ্গ-তামাশাময় কৌতুককর নাট্যদৃশ্য যেন —কৌতুকপ্রিয় বিষ্ণুর ঘুরন্ত ঠাট্টায় এবং এয়োগণের কন্দলের তীক্ষ্ণধার বাক্যবাণে জর্জরিত। পরক্ষণে শিবের মোহন বেশ ধারণ ও কাহিনীর গতিতে চমৎকার মোহসঞ্চার

—হরগৌরীর বিবাহে এবং পরিশেষে আনন্দিত মিলনে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণে যার পর্যবসান,

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মনিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণা ধরি রে।

নাটকের প্রথম অঙ্কের এখানে সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যপটে, হরগৌরীর সংসারযাত্রা, কন্দল, শিবের গৃহত্যাগ ও ভিক্ষাযাত্রা, বিফল হয়ে অবশেষে লক্ষ্মীর পরামর্শে গৃহে প্রত্যাবর্তন, দেবী অন্নপূর্ণামূর্তি দর্শন, এবং দেবীদত্ত অন্ন ভোজন করে পরমানন্দে নর্তন, দেবীর সকৌতুক তৃপ্তির প্রসন্নতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে চিত্রের পর চিত্রের প্রাণবন্ত পারম্পর্যে।

কাহিনীতে বাস্তবতার সঙ্গে রোমাঞ্চকরতার রঙ্ লেগেছে ভিখারী শিবের বেদনাদায়ক অথচ কৌতুককর ভিক্ষাযাত্রার বর্ণনায়। বৃদ্ধ ভিখারীকে দেখে রঙ্গপ্রিয় বালকেরা ভিড় করে আসে, "শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙা।" তাদের নানা কৌতূহল ও আগ্রহ,—

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল॥

অন্যান্য দিন বালকদের সঙ্গে এই আমোদের খেলায় যোগ দেন শিব, কেননা এ ছিলো তাঁর নিত্য কর্মের অঙ্গ। কিন্তু আজ ক্ষুধার্ত ও গৃহিণীর সঙ্গে বিবাদে মানসিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত শিবের কিছুই ভালো লাগে না।

আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই।
ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥

তবু এই দুঃখ ও যন্ত্রণা বেশি স্থায়ী হয়নি। কাহিনীতে নূতন তৃপ্তির আনন্দ-চাঞ্চল্য এসে যুক্ত হয়েছে, যখন গৃহপ্রত্যাগত শিবকে অন্নদান করেছেন দেবী অন্নপূর্ণা এবং সেই অন্ন ভোজন ক'রে আনন্দে নৃত্য করেছেন 'নাটক ঠাকুর'; শিব ও চণ্ডীর বিবাদ মিটেছে নিঃশেষে।

অতঃপর মর্ত্যভূমির উপরে শিব-ত্রিশূলাগ্রে স্থাপিত অমর্ত্যনগরী কাশীতে অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণ বিশ্বকর্মার দ্বারা, সে মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা, সেই মূর্তিতে দেবীর অধিষ্ঠানের জন্য শিব এবং অন্যান্য দেবতা ও ঋষিদের কঠিন তপস্যা এবং অবশেষে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, ইত্যাদি কাহিনীর চিত্রধর্মকে আরও সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে। কাহিনীর সরল গতিতে এখানে প্রকাশ পেয়েছে তপোবল এবং অন্নব্রহ্মের মহিমা। কাশীতে অসপত্ন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দেবী অন্নপূর্ণা। এ পর্যন্ত কাহিনীর গতি মোটামুটি মঙ্গলকাব্যধারাসম্মতভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

এরপরই এসেছে সেই অভিনব নূতন দেবখণ্ডীয় বিরোধ-জটিল কাহিনী, নায়ক যার অতীত ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বেদবিভাজক ও পুরাণকার স্বয়ং বেদব্যাস। এই কাহিনীর উৎস স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড। মহাজ্ঞানী মহাজনও যে জ্ঞানপ্রমাদে প'ড়ে আত্মমোহে উদ্‌ভ্রান্ত হতে পারেন কাশীখণ্ডে তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কাহিনী বলা হয়েছে। ঠিক অনুরূপ অভিপ্রায়েই ভারতচন্দ্রও এই ব্যাস-কাহিনীতে দেখিয়েছেন, অদ্বৈতসত্যের আশ্রয়চ্যুত হলে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিজনিত গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হলে, স্বয়ং ব্যাসদেবের মতো অসাধারণ বিদ্যা এবং জ্ঞানও সম্পূর্ণ বিফল হয়ে যায়। প্রকৃত সত্যের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত বিদ্যা সমুদ্রপ্রমাণ হলেও তা অসার—এই তত্ত্বই ব্যাস-উপাখ্যানের মূল বক্তব্য। তীব্র বেদনায় এজন্যই ব্যাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে,

পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥

নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রভৃতি ঋষিদের কাছে ব্যাসের শিবনিন্দা থেকে শুরু ক'রে শিবকর্তৃক ব্যাসের কাশীবাস নিষিদ্ধকরণ পর্যন্ত ভারতচন্দ্র পুরোপুরি কাশীখণ্ডে বর্ণিত কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। পুরাণে কাহিনী বর্ণনারীতিতে সাধারণতঃ কোন নাটকীয়তা থাকে না কিন্তু কাশীখণ্ডের বর্ণনায়ও এই কাহিনী রীতিমতো নাটকীয়। অতএব বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি, শিবজয়ধ্বনির সঙ্গে কৃষ্ণসংকীর্তনের মহাকোলাহল, শিষ্যগণসহ ব্যাসের কাশীযাত্রা, শিব এবং বিষ্ণুর নামাবলী-কীর্তন, কাশীতে ব্যাসের শিবনিন্দাকালে নন্দী কর্তৃক ব্যাসের ভুজস্তম্ভ ও বাক্‌স্তম্ভ, অতঃপর বিষ্ণু কর্তৃক ব্যাসকে ভর্ৎসনা ও অলক্ষ্যে ব্যাসের বাক্‌স্তম্ভমোচন, ব্যাসের শিবস্তব ও ভুজস্তম্ভ থেকে মুক্তি—সমস্তই বিস্তারিতভাবে কাশীখণ্ডে আছে। অতঃপর ব্যাসের ধর্মবোধ পরীক্ষা করার জন্য শিব ব্যাসের ভিক্ষা নিষেধ করলেন কাশীতে; কাশীখণ্ডে এরূপ বলা হয়েছে। ভারতচন্দ্র এখানে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে শিবমুখে ব্যাসের

ধর্মীয় গোঁড়ামির নিন্দা শুনিয়েছেন এবং ধর্মবোধের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার জন্যই ব্যাসের শাস্তি ও শিক্ষার জন্য কাশীতে ভিক্ষা বারণ করেছেন। এরপর শিষ্যসহ ব্যাসের তিনদিন উপবাস, কাশীতে শাপ, পরে অন্নপূর্ণা কর্তৃক তাঁদেরকে অন্নদান, বৃদ্ধবেশী শিবের সঙ্গে ব্যাসের ধর্মালোচনা, ব্যাসের ধর্ম উপদেশ এবং ধর্মাচরণে স্ববিরোধের প্রতি লক্ষ্য নির্দেশ করে শিবের ক্রোধ ও অভিশাপ, অন্নপূর্ণার কাছে ব্যাসের করুণ আবেদন, এ সমস্তই কাশীখণ্ডের বিবরণ অনুযায়ীই বর্ণনা করেছেন ভারতচন্দ্র। পুরাণ-কাহিনীর এই নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা ভারতচন্দ্রের কাব্যকলাকেও মানিয়েছে সুন্দরভাবে।

কিন্তু এরপরই কাহিনীতে অভিনবত্ব এনেছেন ভারতচন্দ্র। কাশীখণ্ডে ব্যাসের কাশীবাস নিষিদ্ধকরণের ঘটনাতেই আখ্যানের শেষ। এখানে শিবাভিশপ্ত ব্যাস নিজেই অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, অন্তত যেন তিনি প্রতি অষ্টমীতে, চতুর্দশীতে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেন।—

প্রত্যষ্টমি সদা ক্ষেত্রে প্রতিভূতক্ষ পার্বতি।
দিশ প্রবেশনাদেশং নেশত্তদ্বাক্যলঙ্ঘকঃ॥

ব্যাসদেব সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন তাঁর ধর্মবোধের বিভ্রমজনিত অপরাধ।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেবে আরও অনেক জটিল বৃত্তি সংক্রমিত। অতএব প্রাচীন কবির মতো ভ্রমস্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গেই তাঁর আত্মাভিমান শেষ হয়ে যায়নি। ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেব তাই অন্নপূর্ণার কাছে কাশীপ্রবেশের সামান্য আবেদন জানাননি। দেবীই নিজে থেকে তাঁকে বলেছেন—

কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্বথা।
আমার আজ্ঞায় চতুর্দশী অষ্টমীতে।
মনিকর্ণিকার স্থানে পাইবে আসিতে॥

ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেব শুধু যে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির দ্বারা আক্রান্ত তাই নয়, এই ব্যাসদেবের চিত্তে আরও বড় মোহ হোল তাঁর অতি তীব্র অহংকার। সেই অহংকার আহত সর্পের মতো ফণা তুললো এখন। অপমান জ্ঞান করলেন তিনি মহাদেবের শাসনে। ভ্রমদর্শন করেও জ্ঞান ও খ্যাতির অহমিকা ত্যাগ করতে পারলেন না তিনি। যে অহংকার তাঁর ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে প্রণোদিত করেছিলো, সেই অহংকারই এবার তাঁকে উত্তপ্ত করে তুললো শিব-প্রতিস্পর্ধী হবার দুরন্ত বাসনায়। তিনি সংকল্প করলেন, তাঁর সমস্ত অতীত সুকৃতিফল ও তপোবলের দ্বারা দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করবেন—

নিজ নাম জাগাইব এইখানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন।

অতএব নূতন করে ভেদবুদ্ধি অবলম্বন করে ব্যাসদেব স্থির করেন ব্রহ্মা সবার বড়; সেই ব্রহ্মার তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন। এই সংকল্প নিয়ে তিনি গেলেন গঙ্গার কাছে। তাঁকে স্তবে তুষ্ট করে প্রার্থনা জানালেন তাঁর কাশীতে গঙ্গাকে প্রবাহিত হবার জন্য। কিন্তু গঙ্গা তাঁকে উপহাস করলেন তাঁর দুর্বুদ্ধির জন্য। অহংকৃত ব্যাস তখন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গঙ্গার বংশপরোনাস্তি নিন্দাবাদ করায়, গঙ্গাও ব্যাসদেবের চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করে স্থান ত্যাগ করলে, ব্যাসদেব বিশ্বকর্মাকে তপস্যার আস্থান জানিয়ে পুরী নির্মাণের অনুরোধ জানালেন। বিশ্বকর্মা প্রথমেই শিবালয় নির্মাণ করতে চাইলে ব্যাসদেব আবার ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বকর্মাকেও কঠিন তিরস্কার করে বিদায় দিলেন। পরে একইভাবে তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেন ব্রহ্মার দ্বারাও। ব্রহ্মা শান্ত কথায় ব্যাসের বিভ্রম দূর করতে চাইলেন,

অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥

কিন্তু ব্যাসদেবের মোহ দূর হোল না। অহংকার চিত্তকে কতদূর যে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে তার প্রমাণ দিলেন ব্যাসদেব, তাঁর শিববিরোধী ক্রিয়াকাণ্ডের সাফল্যের জন্য অবশেষে অন্নপূর্ণার শরণ গ্রহণ করে। অহংকারের রাহুগ্রাসে তপোবলও হোল কলঙ্কিত, 'বেলারসে পরিপূর্ণা' অন্নপূর্ণার সংসারে ক'লে উঠলো বিষবৃক্ষ হয়ে। আসন্ন হোল ব্যাসদেবের জীবনে চরম ট্রাজেডী। বিরক্ত ক্ষুব্ধ অন্নপূর্ণা অন্নতীবেশে ছলনা করলেন ব্যাসদেবকে। বুঝিয়ে দিলেন, সমুদ্রপ্রমাণ জ্ঞান নিয়েও প্রকৃত বোধের অভাবে তাঁর তপস্যাকালেই আরাধ্যা দেবীকে চিনতে পারলেন না ব্যাসদেব। বাহিরের ছলনার আবরণ ভেদ করার মতো অন্তর্দৃষ্টি তিনি হারিয়ে বসে আছেন অহংকারে মোহান্ধ হয়ে। ব্যাসদেব অবশেষে বুঝতে পারলেন তাঁর সামর্থ্যের সীমা, সর্ব অহংকার চূর্ণ হোল তাঁর। মোহাবরণ ছিন্ন হতে তাঁর এতোটাই সময় লাগলো। এইভাবে ব্যাসের কঠিন ব্যর্থতা চিত্রণের মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্র প্রকারান্তরে উল্টোভাবে দেখালেন, দেবী অন্নপূর্ণা শুধু যে ভক্তকে অন্নদানই করেন তা নয়, ভক্তের মোহান্ধতাও তিনি দূর করেন; ভক্তের চৈতন্যকে তিনি কলঙ্কমুক্ত করেন। এইখানেই দেবীর মহিমা। সেজন্য ছলনার আশ্রয়ও যদি নিতে হয় তাতেও দেবতার গৌরবহানির কোনো কারণ নেই।

এইখানেই ভারতচন্দ্রের 'নূতন মঙ্গল' কাব্যে ব্যাস-কাহিনীর তাৎপর্যপূর্ণ সম্প্রসারণ। কাহিনীর উত্তরাংশে কবিকল্পনার মৌলিকতায় এবং ভক্তিভাবনার নবীনত্বে ভারতচন্দ্র প্রকৃতই তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক কাহিনীতে নূতন রস সঞ্চার করেছেন।